

বিকল্প আধুনিকতার স্থানে ভারতীয় ‘অস্মিতা’: বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ
দর্পণ ভট্টাচার্য

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/14_Darpan-Bhattacharjya.pdf

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতক থেকে ভারতীয় বৌদ্ধিক পরিসরে বিকশিত হতে থাকে বিকল্প আধুনিকতার খোঁজ। যার কেন্দ্রে অবস্থান করেছিল ‘অস্মিতা’ নির্মাণের প্রয়াস বা ভারতীয় হিসেবে নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্তাকে তুলে ধরা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দ — এই দুই চিন্তকের রচনায় সেই নির্মাণের দিশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হলেও উভয় চিন্তকই ইউরোপকেন্দ্রিক আধুনিকতার একচ্ছত্র যুক্তিবাদী দাবিকে প্রশ্নবিন্দু করেন। আলোকপ্রাপ্তি-পরবর্তী যুক্তিবাদ কীভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের হাতিয়ার হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করে — তা এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য যুক্তি-কাঠামোর মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে আত্মগৌরব ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠন এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। ঔপনিবেশবাদের ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করার ফলে তাঁদের কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকলেও, উভয়ের চিন্তাই পাশ্চাত্য আধুনিকতার ভেতর থেকেই এক স্বতন্ত্র ভারতীয় বিকল্প আধুনিকতার পথ উন্মোচন করে।

সূচক শব্দ: বিকল্প আধুনিকতা, ভারতীয় অস্মিতা, ঔপনিবেশিক যুক্তিবাদ, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ।

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলার উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে পঁচিশ বছরের ছোটো। দুজনের পরিবারই ছিল ঔপনিবেশিক যুগে তৈরি হওয়া নতুন বৃত্তিগুলির প্রথমকালীন অংশগ্রহণকারী। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে দুই পুরুষে পাঁচজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।^১ অন্যদিকে বিবেকানন্দের পরিবারে তাঁর প্রপিতামহ থেকে শুরু করে পিতা পর্যন্ত সকলেই আর্টস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।^২ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হলেও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এ পাস করেন।^৩ অন্যদিকে, বিবেকানন্দ কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করার পরে জেনারেল অ্যাসেম্বলিস ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। সেখান থেকে এফ.এ এবং বি.এ পাস করার পর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে আইন বিভাগে ভর্তি হন।^৪ যদিও তাঁর আইন পাঠ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রথাগত শিক্ষার দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, তাঁদের একাডেমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা পরিকাঠামোর মধ্যেই।

দুই

পাশ্চাত্য শিক্ষা আসলে এক ধরনের চিন্তাভাবনার বিস্তার ঘটিয়েছিল ভারতে। যে চিন্তাভাবনার পেছনে কাজ করেছিল এক ধরনের যুক্তিবাদ। যাকে আমরা আলোকপ্রাপ্ত-পরবর্তী যুগের যুক্তিবাদ (Post-Enlightenment Rationality) হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।^৫ ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও চিন্তা জগতের ইতিহাসে মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী অথবা প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত একটা যুগের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘আলোকপ্রাপ্তির যুগ’ বা ‘এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট’। কারো মতে ফরাসি চিন্তা ধারায় এর সূত্রপাত, আবার অনেকে মনে করেন ইংল্যান্ডের বেকন, হবস ও লক — এই চিন্তা ধারার অগ্রদূত। আলোকপ্রাপ্ত যুগের মূল সূত্র

হলো — নির্বিচারে গতানুগতিক ধর্মীয় বা অন্য নিয়ম বা প্রথাগুলোকে না মেনে নিয়ে যুক্তির আলোকে সবগুলির বিশ্লেষণ করা।^৬ যুক্তি মানে লজিক বা রেশনালিটি। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তাঁর “হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট” (১৭৮৪) প্রবন্ধে এনলাইটেনমেন্টের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, আলোকপ্রাপ্তি হচ্ছে মানুষের শৈশবোচিত অপরিপক্বতা থেকে পরিপক্ব পরিশীলিত প্রাপ্তবয়স্কের কোটিতে উত্তরণ। ‘শৈশব অবস্থা’র অর্থ হলো নিজের বিচারবুদ্ধি যারা ব্যবহার করতে জানে না তাদের পরবুদ্ধিনির্ভরশীলতা। কান্টের মতে, মানুষ নিজের দোষে নিজের বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে শেখে না। ‘আলোকিকতা’ যুগের প্রধান বাণী হলো নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করার জন্য সাহস করে এগিয়ে আসা।^৭

কালক্রমে এই যুক্তিই ‘আধুনিকতা’র চিন্তা ও সংস্কৃতির একমাত্র মানদণ্ড হয়ে ওঠে। আলোকপ্রাপ্তির যুক্তিবাদ ঔপনিবেশিক সময়ে কিছু সংখ্যক ভারতীয়ের কাছে ‘আধুনিকতা’র সংজ্ঞা নিরূপণ করে দেয়।^৮ এই ‘আধুনিকতা’ শিখিয়েছিল স্ববিরোধের বিরোধিতা, অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সমাবেশ সহ্য করতে না পারার মানসিকতা। অর্থাৎ প্রথাগত যুক্তির সঙ্গে যা মিলবে না, তাকে অস্বীকার করা এবং ‘আমার যুক্তি’র মধ্যেই শুধুমাত্র সত্যের সম্মান পাওয়া সম্ভব — এই ঔন্মত। যুক্তির বিচারে যে উত্তীর্ণ হতে পারবেনা, সে পরাজিত এবং তা পরিত্যাগযোগ্য। এখন প্রশ্ন হলো যে, কোন্ যুক্তি সত্য? কোনো বিষয়ে সমাজের একাধিক যুক্তি থাকতেই পারে, কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে যে যুক্তি দেওয়া হয়, সেই যুক্তিই সমাজের বেশিরভাগ অংশের কাছে সত্য হয়ে ওঠে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ঔপনিবেশিক শাসকদের যুক্তি সত্য হয়ে উঠল এবং শাসিতের যুক্তি মিথ্যে হয়ে গেল। ঔপনিবেশিক শাসক এবং ওরিয়েন্টালিস্টরা সেই দাবি করতে শুরু করেন। লর্ড মেকলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক বিবরণীতে প্রাচ্যবিদ্যাকে পুরোপুরি অবজ্ঞার চোখে দেখেন। এতে বলা হয় “ভারত ও আরবের সমস্ত দেশীয় সাহিত্যের যা মূল্য, তা ইউরোপের যে কোনো ভালো গ্রন্থাকারে একটিমাত্র তাকে সাজানো বইয়ের সমান।”^৯

তিন

এই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতক থেকে ভারতীয় বৌদ্ধিক পরিসরে বিকশিত হতে থাকে বিকল্প আধুনিকতার খোঁজ। যার কেন্দ্রে অবস্থান করেছিল ‘অস্মিতা’ নির্মাণের প্রয়াস বা ভারতীয় হিসেবে নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্তাকে তুলে ধরা। ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে বড়ো হয়ে উঠলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় সেই নির্মাণের দিশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইউরোপকেন্দ্রিক আধুনিকতার অনুকরণে নয়, বরং সাংস্কৃতিক স্বাভাব্য ও আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়ে তাঁরা গড়ে তোলেন এক অন্য বৌদ্ধিক আধুনিকতা। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই বিকল্প আধুনিকতার সম্মুখে ভারতীয় ‘অস্মিতা’ নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন, তবুও তাঁদের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক ও কৌশলগত পার্থক্য — যা তাঁদের রচনাবলী ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারেন যে, ওরিয়েন্টালিস্টদের রচনা পড়ে শিক্ষিত ভারতীয় মন সেই ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে ভারতীয়রা নিজেদের সংস্কৃতিকে হীন বলে ভাবতে শিখেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে তিনি মনে করতেন যে, ভারতীয়দের প্রচুর অতীত গৌরবের বিষয় থাকলেও তারা নিজেদের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করে রাখেন নি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যে সমস্ত বইতে পাওয়া যায়, তা ইউরোপীয় মানদণ্ডে অর্থাৎ ইউরোপীয় ‘আধুনিকতা’র যুক্তি অবলম্বন করে লেখা হয়নি। এই সমস্ত গ্রন্থে ছিল বাস্তব ঘটনার পাশাপাশি অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার উপাদানও।^{১০} বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, এর ফলে কতকগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃত জানা পণ্ডিত ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে নিন্দা করার সুযোগ পেয়ে যান।^{১১} বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে এই ওরিয়েন্টালিস্ট মতের প্রতিবাদ করা।^{১২} বঙ্কিম জানতেন যে পাশ্চাত্য মতকে খণ্ডন করতে হলে পাশ্চাত্য যুক্তিকে বাদ দিয়ে তা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ ভারতে বা বিশেষ করে

বাংলায় শিক্ষিত মানুষরা ইউরোপীয় পাশ্চাত্য শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে, তার ফলে তাদের মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য যুক্তিতে আচ্ছন্ন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবদগীতা-র ভূমিকায় লিখেন, “... এখন আমাদের “শিক্ষিত” সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না।”^{১৭} ভারতীয় আত্মপরিচয় নির্মাণের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য যুক্তিকে আশ্রয় করেই ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির পুনর্যাত্ম্য করতে শুরু করেন। ধর্মতত্ত্ব বইতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে অনুশীলন তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এই বইয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা চলে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। সেখানে যখন শিষ্য অনুশীলনকে নতুন ধর্ম এবং নতুন কথা ভেবে সংশয় প্রকাশ করেন, তখন গুরু তাঁর সংশয় মিটিয়ে দিয়ে বলেন যে “... নতুন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।”^{১৮}

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলিকে বৃত্তি আখ্যা দিয়েছিলেন, এবং সেগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিনী ও চিত্তরঞ্জনী নামে চারটি পর্যায় বিভক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে এই বৃত্তিগুলির অনুশীলন প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। এই বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে অনুশীলন করতে পারলে মানুষ ঈশ্বর লাভ করতে পারবে। তাঁর মতে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তাই সর্বভূতে প্রীতি ছাড়া ধর্ম হয় না, মনুষ্যত্ব হয় না এবং ঈশ্বরের ভক্তিও হয় না। এই সর্বভূতে প্রীতি বলতে তিনি বলেছেন, আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, পশুপ্রীতি ও স্বদেশ প্রীতি। ধর্মতত্ত্ব আলোচনা শেষে গুরু বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেন, “... তুমি অনুশীলন তত্ত্ব বুঝিয়াছ। ক্ষণে আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরের ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।”^{১৯}

বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন যে স্বাভাবিক ভাবেই এই ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে — চারটি বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে অনুশীলন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব? তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিন্তে ধর্মান্বিতা ও সুরসে রসিকতা এবং তার উপর শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া একাধারে দুর্লভ। তবে ভারতে এমন অনেক মানবদেহী ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা সর্বগুণ বিশিষ্ট এবং সর্বপ্রকার বৃত্তি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যেও একজন ছিলেন সকলের আদর্শ।^{২০} সেই আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, “... যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায় — যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম লক্ষণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই।”^{২১} তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ‘মহাভারত’, ‘হরিবংশ’ ও পনেরোটি পুরাণ পর্যালোচনা করে যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কল্পকে কোনো কোমল শিশুশুলভ দেবতা হিসেবে দেখেননি, এমনকি কল্পকে কোনো কৌতুকপ্রিয়, স্ববিরোধী, লীলাখেলায় মত্ত ঈশ্বর হিসেবেও দেখেননি। বঙ্কিমচন্দ্র কল্পকে একজন সম্মানীয়, ন্যায়পরায়ণ, নীতিবাদী, কঠোর দেবতা হিসেবে দেখেছেন, যিনি একটি যথার্থ ধর্ম হিসেবে হিন্দু ধর্মের গৌরব রক্ষা করেন এবং এক অবিচল নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে রক্ষা করেন।^{২২}

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য যুক্তিকে অবলম্বন করে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের পুনর্যাত্ম্য তৈরি করেন। যা সেই সময়ে ভারতীয় আত্ম-পরিচিতি বা অস্মিতা নির্মাণের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে যান স্বামী বিবেকানন্দ, যদিও বঙ্কিমের থেকে অনেকটাই ভিন্ন পথে। এখন আমরা দেখব স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে এই পাশ্চাত্য আধুনিকতার বাইরে গিয়ে এক ভিন্ন আত্ম-পরিচিতি নির্মাণের প্রয়াস করেছিলেন।

চার

স্বামী বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতবর্ষ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন তৎকালীন পরিস্থিতিতে ভারতের মানুষ যে ভাব নিয়ে চলছিল, তা মোটেও যুগোপযোগী নয়। সেই ভাব নিয়ে ভারত চললে ভারতের

মানুষের পারমার্থিক মুক্তি তো অনেক দূর রাজনৈতিক মুক্তিও আসবেনা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশ কিছু ভারতীয়, ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকে নিজেদেরকে শাসকের মতো সাজিয়ে তুলতে চাইছে। যারা এই ধরনের ভাবনা ভাবছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, “ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে, ‘আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ,’ এ কথা ঠিক হতে পারে – তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে ওই ‘আমরা’র দেশ শুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্ দিশি ভদ্রতা হে বাপু?”^{১৯} কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন যে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ শাসকরা খুব সূক্ষ্মভাবে এই ভাবনার সঞ্চার ঘটিয়েছে মূলত উপনিবেশ বিস্তারের কৌশলরূপে।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকরা এক সাংস্কৃতিক আধিপত্য চালিয়েছিল ভারতের মানুষদের উপর। সেই আধিপত্যকে ভারতীয়রা যদি চ্যালেঞ্জ না করতে পারে তাহলে ভারতীয়দের এই পরাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তিনি তাঁর ইংরেজ শিষ্য গুডউইনের সঙ্গে ভারতের পরাধীনতা বিষয়ক আলোচনায় বলেছিলেন যে, “দ্যাখ্, এই ভারতবর্ষটিকে hypnotise করে ফেলেছে তাইতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীদের বুকের উপর বসে রক্ত চুষে খাচ্ছে। কিন্তু যেদিন hypnotism (মোহিনীশক্তি) চুলোয় যাবে এবং ভারতবাসীর নিজেদের ভিতরকার শক্তি বুঝতে পারবে, সেদিন তোমাদের চেপটে মেরে ফেলবে – will squeeze you like lemon!”^{২০}

ভারতীয়দের এই সাহসহীন, উদ্যমহীন, বিষন্ন ও হতাশ মনকে আশা ভরসা দিতে না পারলে তাদের দিয়ে কোনো মহান কাজ তো দূর সামান্য দেশের স্বাধীনতাও আসবে না। তিনি যেহেতু মনে করতেন ভারতে বহু বছর ধরে সমস্ত কাজ হয়ে এসেছে ধর্মের মধ্যে দিয়ে সেহেতু এই কাজটিও তিনি সম্ভব করবেন ধর্মের মধ্যে দিয়েই। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজের একটি অন্যতম গুণ হলো ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা। যেহেতু ভারতীয়দের মধ্যে আগে থেকেই এই বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে, তাই তাদের মধ্যে সেই গুণকেই বিকশিত করা উচিত। তিনি বলেছেন, “... একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, ‘রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানো কি?’ সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিবে, ‘এটা আবার কি?’ সোশ্যালিজম প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, পরিশ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সে জীবনে কখনো শোনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে – রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকুই বুঝে। কিন্তু তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করো, ‘তোমার ধর্ম কি?’ সে নিজের কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, ‘আমি এই সম্প্রদায় ভুক্ত।’ ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দুই-একটি কথা বাহির হইবে যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি।”^{২১} তিনি মনে করেছিলেন যে ভারতের ধর্ম অর্থাৎ তাঁর ভাষায় বেদান্ত ধর্মের যে মূল দর্শন তা অসামান্য, কারণ বেদান্ত মতে রয়েছে – সকল মত, সকল পথেই ধর্ম লাভে সকলের সমান অধিকার। ভারতীয়রা যদি সেই দর্শনকে বোঝে এবং বাইরে প্রচার করে তাহলে ভারতীয়দের দেশের বাইরে একটা সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। স্বামীজী পাশ্চাত্য সমাজে ভারতীয় সংস্কৃতি – ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা প্রচারের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের মানুষকে প্রভাবিত (ইনফ্লুয়েন্স) করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা নিজস্ব যুক্তিবোধ প্রয়োগ করে ওরিয়েন্টালিস্টদের তৈরি করা ভারতীয় সংস্কৃতির বিপরীতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অন্যভাবে বিচার করতে শেখে। ইউরোপীয় – ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রতিষ্ঠা করা ভারতীয় সংস্কৃতির পাল্টা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, “পাশ্চাত্যের অনেকে তোমাদিগকে অর্ধদানব বর্বর জাতি মনে করে, সুতরাং ভাবে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সভ্য করে তুলতে হবে। তোমরা এর বিপরীতটা প্রমাণ করো না কেন?”^{২২} তাঁর পাশ্চাত্যে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে, ভারতীয় হিসেবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা। তা তিনি শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা ১৫ই নভেম্বর ১৮৯৪ সালের একটি চিঠিতে জানান। তিনি লেখেন, “... একজন সন্ন্যাসীর এদেশে আসিবার কী প্রয়োজন ছিল, আপনি হয়তো তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ছিল। জগতের নিকট আপনাদের পরিচয় এর একমাত্র দাবি – ধর্ম, এবং সেই ধর্মের পতাকা বাহি যথার্থ খাঁটি লোক ভারতের বাহিরে প্রেরণ করিতে হইবে, আর তাহা হইলেই ভারতবর্ষ যে আজও আছে,

তবে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম প্রচারের সময়েও পাশ্চাত্য যুক্তি কাঠামোর সাহায্যেই ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছিলেন। সে সম্পর্কে তিনি নিজে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর শিষ্য শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, “ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম।”^{২৪} এখানে ঠাকুর বলতে তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, যাঁর জীবনচরিত পাশ্চাত্য যুক্তি কাঠামোয় মাপা অসম্ভব, যিনি বিবেকানন্দকে বলেছিলেন “... আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি; তবে এর চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠরূপে।”^{২৫}

পাঁচ

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই পাশ্চাত্য আধুনিকতার বিকল্প হিসেবে ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে ভারতীয় অস্মিতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ওরিয়েন্টালিস্ট মতকে খণ্ডন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন এবং আধুনিকতার যুক্তি কাঠামোর মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর লক্ষ ছিল ভারতীয় বা বিশেষ করে বাঙালি মননে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি গৌরব বোধ জাগানো। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সূক্ষ্ম কৌশলকে চ্যালেঞ্জ জানান। ওরিয়েন্টালিস্ট মতের বিপরীতে ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। শুধুমাত্র ভারতীয় মনন বদলের চেষ্টায় না থেমে থেকে পাশ্চাত্যের মানুষের মননে ভারত সম্পর্কে বিশেষ করে ভারতের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন বিশ্লেষণে তিনি পাশ্চাত্য যুক্তির আশ্রয় নেন, যদিও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য যুক্তিকে খণ্ডন করা এবং তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের মত বা পাশ্চাত্য যুক্তির বাইরের অন্য এক ভারতীয় যুক্তির সাহায্যে ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা করা।

ভারতীয় অস্মিতা নির্মাণে বঙ্কিমের প্রচেষ্টা যেখানে ভারতীয় মনন বদলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, বিবেকানন্দ তার থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভারত ও পাশ্চাত্য — উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় অস্মিতা নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন। আসলে সময়কালগত দিক থেকে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্র যে উপনিবেশবাদকে প্রত্যক্ষ করেছিলে, বিবেকানন্দ তার থেকে অনেক পরিণত উপনিবেশবাদকে প্রত্যক্ষ করেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দুই চিন্তকের চিন্তায় কৌশলগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করায় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল, সেসব প্রতিবন্ধকতা বিবেকানন্দের ছিল না। যদিও বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবনের ক্ষেত্রে আরো অন্যরকম প্রতিবন্ধকতা ছিল। তবে দুজনেই প্রথাগত রাজনীতিতে প্রবেশ না করেও পাশ্চাত্য আধুনিকতার মধ্যে থেকেই বিকল্প চিন্তা-ভাবনার সন্ধান করেন এবং সেই চিন্তা-ভাবনা ভারতীয় অস্মিতা নির্মাণের সহায়ক হয়। বিকল্প আধুনিকতা ও ভারতীয় অস্মিতার সন্ধানে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. ‘ইউরোপ পুনর্দর্শন’, তপন রায়চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০০
২. ওই, পৃ. ১৮৭
৩. ওই, পৃ. ৯৮
৪. ‘যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড’, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬
৫. ‘পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর: আধুনিক ভারতের ইতিহাস’, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৭৯

৬. ‘নীতি যুক্তি ও ধর্ম: কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ’, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৬২
৭. ওই, পৃ. ৬৪
৮. ‘পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর: আধুনিক ভারতের ইতিহাস’ (পূর্বোক্ত), শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭৯
৯. ‘The History of Education in Modern India 1757-1986’, Suresh Chandra Ghosh, Hyderabad, Orient Longman, 1995, pp. 31-33
১০. ‘বঙ্কিম রচনাবলী’, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪২০, পৃ. ২০৫
১১. ওই, পৃ. ৩৫৬
১২. ওই
১৩. ওই, পৃ. ৬১৬
১৪. ওই, পৃ. ৫৩০
১৫. ওই, পৃ. ৬০৭
১৬. ওই, পৃ. ৩৫৪
১৭. ওই
১৮. ‘The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism’, Ashis Nandy, New Delhi: Oxford University Press, 2009, pp. 23-24
১৯. ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড’, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১১৯
২০. ‘লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ’, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ২০২১, পৃ. ১১৩-১১৪
২১. ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা’, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৮
২২. ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা’, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১০৪
২৩. ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা’, সপ্তম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
২৪. ‘শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, স্বামী-শিষ্য-সংবাদ’, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২০
২৫. ‘যুগনায়ক বিবেকানন্দ’, স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৩

লেখক পরিচিতি: দর্পণ ভট্টাচার্য, গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ। লেকচারার, শ্রী অগ্রসেন কলেজ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।